দ্বিতীয় সংখ্যা

আগষ্ট, ২০১৯

শূন্য থেকে শুরু

অঙ্কের গল্প



রামানুজন ম্যাথ সার্কেল, কোচবিহার

উচ্চতর গণিত-সমস্যার নির্মাণ

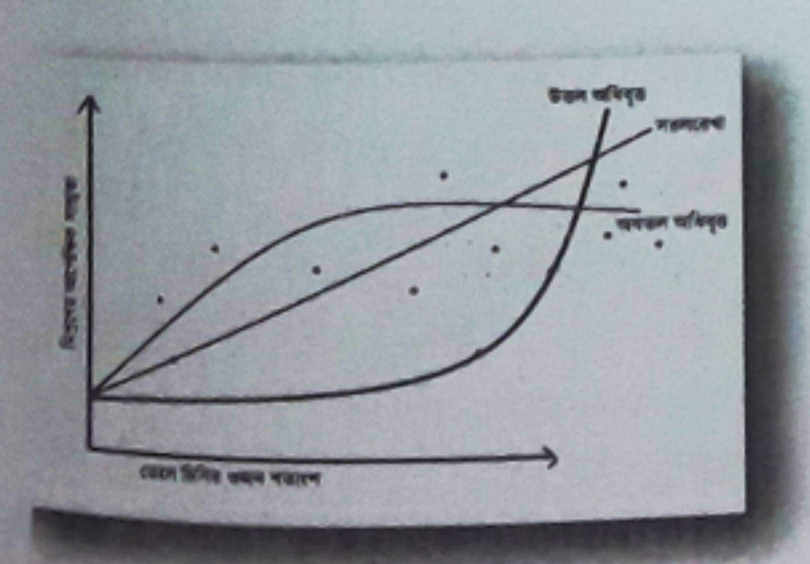
শমীক সরকার

ধরা যাক, তুমি সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি মাপছ, ভিসকোমিটার যন্ত্র দিয়ে। সরষের তেল নিয়েছ। তার মধ্যে চিনি মেশাচ্ছ। মেশানোর আগে সান্দ্রতা মাপলে। তারপর ধরা যাক, সরষের তেলের ওজনের দশ শতাংশ চিনি সরষের তেলের মধ্যে দিয়ে মাপলে। তারপর বিশ শতাংশ দিয়ে মাপলে। মানে তুমি মিশ্রণ গুলোর সান্দ্রতা মাপছ। তারপর তুমি ত্রিশ শতাংশ দিয়ে মাপলে। এইভাবে একশ' শতাংশ পর্যন্ত দিয়ে মাপলে। তোমার হাতে রইল এগারোটি পরিমাপ - ওই মিশ্রনের সান্দ্রতার।

এইবার তুমি চাইছ, এর থেকেও বেশি চিনি দিলে মিশ্রণটির সান্দ্রতা কত হবে, তা বের করতে। কিন্তু তোমার ভিসকোমিটার বা সান্দ্রতামাপক যন্ত্র এর চেয়ে বেশি আর দিতে পারছেনা। ওই সান্দ্রতা মাপক যন্ত্র যে পরিমাপের মধ্যে সান্দ্রতা মাপতে পারে – তার চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে সান্দ্রতা, যদি আরো বেশি চিনি দেওয়া হয়। জানোই তো, যেকোনো যন্ত্র যা পরিমাপ করে, তা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে করে, তার চেয়ে বেশি করতে পারেনা। যেমন, ধরা যাক, তুমি মুদির দোকানের তুলাযন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কয়েক কেজি চাল, আলু ইত্যাদি মাপতে পারো, কিন্তু এক বস্তা ধান মাপতে পারো কি? সেই রকম, সরষের তেলের মধ্যে একশ' শতাংশ ওজনের চেয়ে বেশি চিনি দিলে ওই সান্দ্রতা মাপক যন্ত্রটি আর কোনো পরিমাপ দিতে পারছেনা।

এবার কী করবে তুমি? ওই মাপগুলি তুমি একটা গ্রাফের মধ্যে নিলে। গ্রাফের ভুজ বা অ্যাবসাইসা, অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর চিনির ওজন শতাংশ। আর কোটি বা অরডিনেট, অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর মিশ্রনের সান্দ্রতা ও শুধু সরষের তেলের সান্দ্রতার অনুপাত, মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতা। এবার ওই গ্রাফে তুমি ওই পরিমাপ বিন্দুগুলি বসালে। তারপর সেই পরিমাপ বিন্দুগুলি কে যোগ করার চেষ্টা করলে পেনসিল দিয়ে একটা রেখা টেনে। তোমার ভাবনা হল, ওই রেখাটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিলেই আরো বেশি চিনি দিলে, ধরা যাক একশ-ত্রিশ শতাংশ ওজনে কত হবে সান্দ্রতা, তা তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে পড়লে সমস্যায়। দেখলে রেখাটি এত আকাবাঁকা হয়েছে এর আগেই, যে কীভাবে এগোবে তা ভাবতে ভরসা পাচ্ছনা (নিচের ছবি দেখো)। তখন কী উপায়?

এইখানে তোমাকে যার শরণাপন্ন হতে হবে, সেটা হল উচ্চতর গণিত। আরো ভালো করে বললে, কলনবিদ্যার। খুব চেনা জায়গা থেকে শুরু করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, ওজন শতাংশের তিল মাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তা হল ধ্রুবক এবং তার মান আমরা জানিনা, ধরে নিচ্ছি 'ক'। এবার আমরা এটাকে অন্তর্কলনের পরিভাষায় লিখব। তোমরা যারা অন্তর্কলন শিখেছ, তারা সহজেই লিখতে পারবে। ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = ক। ডি এক্স হল ওজন শতাংশের তিল মাত্র ফারাক। ডি ওয়াই হল মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার ফারাক। ধরো, এটাকে আমরা বললাম, এক নম্বর ফারাকিকার বা ডিফারেনশিয়াল। এবার এটাকে আমরা যদি সমাকলন করি, তাহলে যারা শিখেছ তারাই বলতে পারবে, আমরা একটা ফাংশান বা ক্রিয়া পাব - তা হল, একটি সরলরেখা (নিচের ছবি দেখো)। এর নতি, অর্থাৎ, ধরে নেওয়া ধ্রুবক 'ক' এর মান আমরা জানতে



পারব, এবং একই সাথে আরেকটি ধ্রুবক-এর, যাকে তোমরা সমাকলন ধ্রুবক বলে শিখেছো। কীভাবে? যদি আমরা চিনির ওজন শতাংশ শূণ্য অর্থাৎ চিনি ছাড়া শুধু সরষের তেল-এর সান্দ্রতা এবং চিনির ওজন শতাংশ দশ-এ সান্দ্রতার পরিমাপ-দুটির সাহায্য নিই। তারপর ওই ক্রিয়াতে ভুজের একটি মানের জন্য কোটির কত মান হবে তা খুব সহজে বের করে ফেলা যায় এবং তা করে করে আমরা ওপরে বর্ণিত সরলরেখাটি পেলাম।

কিন্তু, উঁহু, এই সরলরেখা ওই পরিমাপ বিন্দুগুলির খুব কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছে না গ্রাফে। ফলতঃ আমাদের আরেকটি ফারাকিকার দরকার। ধরে নেওয়া যাক, ওজনের শতাংশের তিল মাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তাহল ওজনের শতাংশ-এর একটি গুণিতক। সেই গুণিতক টি অজানা একটি ধ্রুবক, ধরা যাক 'ক'। এটাও আমরা অন্তর্কলনের পরিভাষায় সহজেই লিখে ফেলতে পারি। ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = এক্স ইনটু ক। ধরো, এটাকে আমরা বললাম, দুই নম্বর ফারাকিকার বা ডিফারেনশিয়াল। এটা সমাকলন করলে আমরা পাবো একটা প্যারাবোলা বা অধিবৃত্ত। তা হল ফাংশান বা ক্রিয়া। অনেকে বলে, সম্পর্ক বা রিলেশন। অনেকে বলে লোকাস বা গতিবিধি। সেই অধিবৃত্তের ধ্রুবকগুলিকেও আমরা পরিমাপ বিন্দুগুলির সাহায্যে বের করলাম। কিন্তু এতেও, মানে এই অধিবৃত্তেও মন সন্তুষ্ট হলো না, গ্রাফে পরিমাপ বিন্দুগুলির বেশ দূর দূর দিয়েই যাচ্ছে দেখছি। অতএব? আরেকটি ফারাকিকার, তিন নম্বর এটা, আবারকী। ধরা যাক, ওজনের তিল মাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তাহল মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার ব্যতিহারিক বা রেসিপ্রোকালের একটি গুণিতক, এবং সেই গুণিতকটি অজানা একটি ধ্রুবক, ধরা যাক, 'ক'। অর্থাৎ, ডি ওয়াই বাই ডি এক্স = ক বাই ওয়াই। দেখা গেল, এটাও একটা অধিবৃত্ত, কিন্তু এর ভুজাক্ষ আলাদা হবার কারণে উত্তল, আগেরটার মতো অবতল নয় (সঙ্গের ছবি দেখো)। যদি এটাতেও মন না ভরে, তাহলে আরেকটি ফারাকিকার নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, সেটা হল – ওজনের শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তাহল ওজনের শতাংশের ব্যতিহারিক-এর একটি গুণিতক। অথবা, আরো একটা ফারাকিকার নেওয়া যেতে পারে – ওজনের শতাংশের তিলমাত্র ফারাকে মিশ্রণের আপেক্ষিক সান্দ্রতার যে ফারাক হয়, তাহল ওজনের শতাংশের ব্যতিহারিকের একটি ধ্রুবমাত্রার একটি গুণিতক। এই ফারাকিকারগুলিকে আর অন্তর্কলনের পরিভাষায় লিখলাম না বা সমাকলন করলাম না, গ্রাফেও দিলাম না। অহেতুক জটিলতা বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

প্রসঙ্গতঃ প্রথম যে ফারাকিকরণ-টির কথা বলা হল – সেটির উদ্গাতা স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। মিশ্রণের সান্দ্রতা নিয়ে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি ক্রিয়া বা ফাংশান উপস্থিত করেছিলেন, সম্ভবতঃ ১৯০৬ সালে। যে ছবিটা আমি দিয়েছি, তাতে সরষের তেল ও চিনির যে মিশ্রণের কথা বলা আছে এবং যে পরিমাপ বিন্দুগুলি দেখানো আছে, তা সম্পূর্ণতঃ আমার মস্তিষ্ক প্রসূত, বাস্তবের সাথে তার সম্পর্ক আছে কিনা আমার জানা নেই। কোনোদিন মাপিনি বা মাপ দেখিনি। যাকগে, যা বলছিলাম। মিশ্রণের সান্দ্রতাকে প্রথম সমস্যায়িত করেছিলেন আইনস্টাইন। তরলের সঙ্গে কঠিনের মিশ্রণ যে তরলের চরিত্র বদল করে তা জানাই ছিল। ধারনা ছিল, সেই চরিত্র বদল ম্যাজিকাল কিছু তরল তৈরি করে। আজব কিছু। আইনস্টাইন তরল-কঠিন মিশ্রণের সান্দ্রতাকে সমস্যায়িত করে তরল-কঠিন মিশ্রণের আজবত্ব ঘুঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রহেলিকার পর্দা খুলে দিয়েছিলেন। পরে দেখা যায়, ভিন্ন ফারাকিকরণ দরকার। কারণ সব ধরনের তরল-কঠিন মিশ্রণকে এই ক্রিয়া বা সমাধান-সূত্র ঠিক মতো বর্ণনা করতে পারছেনা। ফলতঃ ওপরে বর্ণিত প্রায় সবকটি ফারাকিকরণকে ব্যবহার করা হয়েছে তরল-কঠিন মিশ্রণকে সমস্যায়িত করতে। এবং করা হয়ে চলেছে।

******

ওপরের অনুচ্ছেদে একদম শেষের দিকে আমরা দুটি শব্দ এনে ফেললাম। সমস্যায়ন। সমাধান-সূত্র। হ্যাঁ, কোনো একটি ভৌতিক প্রপঞ্চ বা ফিজিক্যাল ফেনোমেনোন-কে সমস্যায়িত করতে হয়। নাহলে তা আজব, প্রহেলিকা, ম্যাজিক্যাল বা ধোঁয়াটে থাকে। ভূতুড়ে বলে মনে হয়। তা দেখে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। দৈব কিছু বলে মনে হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়।

সব ধর্ম দৈবে বিশ্বাস করেনা। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের যিনি প্রচারক, নেপালের সেই ব্যক্তি আড়াই হাজার বছর আগে বলেছিলেন, জগতে সমস্যা আছে। সমস্যার সমাধান আছে। ঠিক এরকম বলেছিলেন কিনা বলতে পারব না। তবে আমি এরকমই বুঝেছি। তা সমস্যা কী? সমস্যা কি খারাপ? না। সমস্যা ভালো জিনিস। সমস্যা তৈরি করতে পারা যাচ্ছে মানে প্রপঞ্চের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটানো যাচ্ছে। সমস্যা দেখে ভড়কে যাবার কিছু নেই।

গণিতের ভূমিকা হল এই সমস্যায়নে। পাটিগণিতের সাহায্যেও সমস্যায়ন করা যায়। যেমন, কেশবচন্দ্র নাগের বইতে আমরা বহু বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। চৌবাচ্চায় ফুটো আছে। জল বেরিয়ে যাচ্ছে। জল ঢাললে ও জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুটো বন্ধ করা যাচ্ছেনা। এবার মাথা খারাপ না করে ঠিক কত বালতি এক্সট্রা জল ঢাললে চৌবাচ্চা ভর্তি হবে, তা খোঁজা যাক। সরল ঐকিক নিয়মই বোধ হয় পাটিগণিত তথা গণিতের সবচেয়ে সহজ সমস্যায়ন। একটা টিয়া তিনটি লঙ্কা খায়। পনেরো টি লঙ্কা শেষ করতে ক'টা টিয়া লাগে? এখন ভাবতে অস্বস্তি হয়না, কিন্তু যদি ভাবো, তোমরা যখন পাটিগণিত শেখোনি, তখন যদি তোমাদের এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যেত? ধরা যাক, প্রপঞ্চটি হল, উঠোনে লঙ্কা মেলা আছে। টিয়ার ঝাঁক আছে কাছের বাগানে। সেখান থেকে টিয়াগুলো আসছে। এসে লঙ্কা খেয়ে যাচ্ছে। একে সমস্যায়িত করা হল। সমস্যায়িত না করলে কী দাঁড়াত ? বা, কী থাকত? এক ঝাঁক টিয়া এসে উঠোনে মেলা লঙ্কা খেয়ে চলে গেল। এই তো হল প্রপঞ্চ। এবার ধরা যাক, তুমি টিয়া তাড়াতে চাওনা। তোমার নীতি কর্তব্যে বাধে। তাহলে কি তুমি উঠোনে লঙ্কা মেলবেনা ? শুকোতে দেবেনা ? না। দেবে। লঙ্কা কিছু কমবে। টিয়া খেয়ে যাবে। কত কমবে লঙ্কা? তোমার যদি হিসেব থাকে, তাহলে তুমি লঙ্কা শুকোতে দিলে কী পরিমাণ ড্যামেজ হবে তোমার, তা হিসেব করতে পারবে। সেটা তুমি আগেই ধরে নেবে, যে ওইটুকু যাবে। তোমার নীতি কর্তব্যও থাকল। বিষয় চিন্তাও থাকল।

পাটিগণিতের মতো জ্যামিতিও সমস্যায়ন করে। কিন্তু পাটিগণিত বা জ্যামিতির তুলনায় অনেক ভালো সমস্যায়ন করে বীজগণিত। এবং তার থেকেও ভালো করতে পারে কলনবিদ্যা। কলনবিদ্যায় সমস্যায়ন নিয়েই আমরা আগে আলোচনা করলাম। কলনবিদ্যায় সমস্যায়নের মৌলিক উপাদান হল ফারাকিকরণ। একটি জিনিসের সামান্য, তিল মাত্র ফারাকে অন্য একটি জিনিসের কতটা ফারাক হয় ? অনেক সময়, অন্য একটি জিনিসের কতটা ফারাক হয় - এই প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ থাকেনা। কোনো জিনিসের সামান্য, তিল মাত্র ফারাক মানে কী, সেটাই অন্তর্কলনের ভাষায় লিখে ফেললেই হয়। যেমন ধরা যাক, একটি জলের পাইপ একটা জায়গায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই দেওয়ালকে বোঝাতে আমি লিখলাম, ওখানে জলের গতিবেগের তিল মাত্র ফারাক হল শূণ্য। এইরকম। কলনবিদ্যাকে সমস্যায়নের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ভাবলে বলতে হয়, ফারাক হল সমস্যায়নের মৌলিক উপাদান। সমস্যার গভীরে আছে ফারাক। গণিতের মানুষদের ফারাক বলতেই ডিফারেনশিয়ালের কথা মনে পড়বে। আচ্ছা এই গণিতের ফারাক কি ফারাক কথাটা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে যে দ্যোতনা বহন করে, তার থেকে আলাদা কিছু ? একেবারেই না। তোমার আর আমার ফারাক আছে। তুমি আর আমি আলাদা। আমরা নিজের নিজের মতো, স্বতন্ত্র। এই দ্যোতনা গুলির সঙ্গে গণিতের ফারাকের কোনো অমিল নেই, পৃথকত্ব নেই। প্রপঞ্চ ভৌতিক হোক বা সামাজিক, এই কথাটা তাই সেক্ষেত্রেও খাটবে - সমস্যার গভীরে আছে ফারাক। আর কে না জানে, এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আলাদা, সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা, নিজের মতো। তাই সামাজিক সমস্যারও গভীরে আছে এই সামাজিক ফারাক। অতএব

গণিতের শিক্ষা থেকে আমাদের আরেকটি জিনিস বোঝা হয়ে গেল – সামাজিক সমস্যা খারাপ কিছু নয়। সামাজিক সমস্যা বরং ভালো। সমাজে প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ধরনের, এটাতো একটা বাস্তব ব্যাপার। গভীরের সেই সামাজিক ফারাক-কে উপরিস্তরে আনলে, ফারাক গুলিকে সম্পর্কিত বা সমীকৃত করলে, মোট কথা হল সামাজিক প্রপঞ্চকে অন্তর্কলন বা ফারাকিকরণ করলে আমরা যেটা পাই – সেটাই সামাজিক সমস্যার রূপ।

উপরের অনুচ্ছেদে আরেকটি শব্দও আমরা পেলাম। সমাধান-সূত্র। এই সমাধান-সূত্রকে আমরা আগে ক্রিয়া বা ফাংশান বলেও উল্লেখ করেছি। ফারাকিকারের সমীকরণের সমাকলনে পাওয়া যায় এই সমাধান-সূত্র। আর স্থানীয় সমাকলনে পাওয়া যায় সমাধান। স্থানীয় মানে কী? স্থানীয় মানে হল, তাকে স্থান এবং কাল সাপেক্ষে সমাকলন করা। সমাকলনকে আবছা ভাবে ধরা যেতে পারে, বাস্তবায়ন। এবার বাস্তবায়নের পরে তো তো মাটি লাগে। ভূমি লাগে। আসল জিনিস লাগে। হিসেব করা যয়, কতটা মাটি লাগবে। ইত্যাদি। কতটা জায়গা লাগবে। কী কী করতে হবে। বাস্তবায়নের পরের ধাপ বলা যেতে পারে স্থাপনায়ন। স্থাপন। তাই সমাকলন, সেটা সমাধান নয়, সমাধান-সূত্র । স্থানীয় সমাকলনকে বলা যেতে পারে সমাধান। আসলায়ন। স্থাপন। এই বাস্তবায়ন বা পরে আসলায়ন বা স্থাপন - এরা স্বাধীন নয়, বোঝাই যাচ্ছে। এরা প্রায় পুরোটাই ফারাকীকরণের ওপর নির্ভরশীল। ওপরের অনুচ্ছেদে আমরা যে ফারাকিকারগুলি একে একে দেখলাম, একেকটার জন্য ক্রিয়া বা সমাধান-সূত্র আলাদা আলাদা। কোনোটা সরলরেখা। কোনোটা উত্তল অধিবৃত্ত। কোনোটা অবতল অধিবৃত্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি। হতেই পারে, কিছু কিছু বিন্দুতে সমাধান বিন্দু একই। কোনো স্থান-কালে সমাধান একই। কিন্তু সমাধান-সূত্রগুলি আলাদা আলাদা।

স্থানীয় সমাকলন বা আসলায়নও কিন্তু যাকে বলে একটা কঠিন কাজ। অনেক সময়ই বেশ কিছু ফারাকিকারের সমীকরণের পূর্ণ সমাকলন করাই যায়না। তখন আংশিক সমাকলনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বাস্তবায়ন খুব সহজ কাজ নয়। সমস্যাটা তৈরি করলেও সমাধান সহজ নয়। এথেকেই বোঝা যায়, সমাধান যেমন সমস্যা নির্ভর – তেমনি সমস্যা কিন্তু সমাধান নির্ভর নয়। সবল বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান হতে পারে। আবার দুর্বল বা আংশিক সমাধানও হতে পারে। অনেক সময় সমস্যাটির সবল বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা যায়না।তখন দুর্বল বা আংশিক সমাধান করে কাজ চালাতে হয়। অথবা নতুন করে ফের সমস্যায়ন করতে হয়। সমাধান বা আসলকরণ – তা বোধ করি সমস্যায়নের চেয়েও কঠিন কাজ। সমস্যায়ন বা ফারাকিকরণ -- সেখানে কল্পনার ভূমিকা বা সৃজনশীলতার ভূমিকা নির্ধারক। আসলকরণ বা স্থানীয়করণ বা সমাধানে পরনির্ভরতা বড্ড বেশি। তাই বেশির ভাগ সময়ই সমাধান থাকেনা। অথবা দুর্বল সমাধান দিয়ে বা ঠেকনো দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। তা কি খারাপ? উঁহু। সমাধান হল সমস্যার অন্ত। সমস্যার শেষ। সমাধান না থাকা বা দুর্বল সমাধান মানে হল – সমস্যাটা অস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়া। সমস্যাটা রয়ে যাওয়া।

সমস্যা রয়ে যাওয়া, সমাধিত না হওয়া। এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোঝার ক্ষেত্রে। সমস্যা কখনোই সমস্যা হিসেবে থেকে যাওয়ার জন্য নয়। সমস্যা মানেই সমাধিত হবার জন্য। প্রপঞ্চের ধোঁয়াশা কাটানোর জন্য। প্রপঞ্চের ধোঁয়াশা কাটে যখন উপরিতলে এবরো খেবরো কিছু থাকেনা, সমতলীয়তা আসে। উপরিতলকে তল হিসেবে লাগে, উপরিতল হিসেবে লাগেনা। উপরিতল মানে হল, যার নিচের তল আছে। যার গভীরে কিছু আছে। উপরিতলকে তল হিসেবে লাগা মানে সেই গভীরতা অনুভূতি আর না থাকা। সমস্যা হল উপরিতলের এবরো খেবরো। সমাধান হল তার সমাধান, সমতলীয় হওয়া। সমস্যা তৈরিই করা হয় সমাধিত হবার জন্য। তাই, সেই সমস্যার থেকে যাওয়া, বা রয়ে যাওয়া, বা দুর্বল ও আংশিক সমাধানের ঠেকনো – এগুলো হল অনস্তিত্ব। অর্থাৎ, থাকার কথা নয় তবুও আছে – এরকম ব্যাপার।

তুমি যদি শুধু সমাধানের দিকে তাকাও, বা সমাধানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকাও, সমাধানের কথা ভাবো - তাহলে নিশ্চিত জানবে, তুমি কোনো না কোনো সমস্যার অধীনে আছো। কোনো না কোনো সমস্যার আসলকরণ করতে চাইছ। সমস্যায়ন করেছে অন্য কেউ। আমাদের সমাধানপন্থী মন অনেক সময় জানতেই পারেনা যে সে অন্য কারোর সমস্যায়নের আসলকরণের কাজটুকুই করছে শুধু। বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সে উত্তর দিচ্ছে মাত্র। প্রশ্নটা করে চলে গেছে অন্য কেউ। সমাধানে আচ্ছন্ন মন সমস্যার গুরুত্ব বোঝেনা। উত্তর প্রত্যাশী মন প্রশ্নের গুরুত্ব বোঝেনা। সে গভীরের ফারাককে দেখতে পায়না। ফারাককে অবজ্ঞা করে।

কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগে যেমন একজন বলেছিলেন, জগতে সমস্যা আছে, সমস্যার সমাধান আছে; তেমনি দেড়শ' বছর আগেও একজন বলেছিলেন, মানুষ কেবলমাত্র সেই সমস্যাগুলিকেই সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, যেগুলির সমাধান সে করতে পারে। এই হল যাকে বলে কূটাভাষ। প্যারাডক্স। সমস্যার চরিত্র ইহল সমাধান যোগ্যতা। সমস্যা মানেই তা সমাধান যোগ্য, না হলে তা সমস্যাই নয়। কিন্তু সমাধান যোগ্য মানেই যে সমাধান করা যাবে এই স্থান কাল পাত্রে – তা তো না-ও হতে পারে! হয়ত করা যেত, কিন্তু তার আগেই সমস্যাটা মিলিয়ে গেছে, রূপ বদল করে ফেলেছে । কূটাভাষ তো এমন-ই হয়। তাই কোনো সন্দেহ নেই, সমাধান করতে চেয়েই আমরা সমস্যা কে বিবেচনা করব। সমাধান করতে চেয়েই আমরা সমস্যাকে তৈরি করি।সমাধান চেয়েই আমরা প্রপঞ্চকে সমস্যায়ন করি। আমরা কোনো ধাঁধা তৈরি করতে চাইছি না। এমন কোনো সমস্যা তৈরি করতে চাইছি না, যা সমাধান যোগ্য নয়। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ – বুদ্ধদেবকে একজন বলেছিল, আমার ছেলে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব তাকে বলেছিল, যাও দেখি এমন বাড়ি থেকে একটা লোক ধরে নিয়ে এস, যাদের পরিবারে কেউ মরেনি কোনোদিন। সে খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারল – মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ মৃত্যু কোনো সমস্যা নয়। তার কোনো সমাধান নেই। মৃত্যু সমস্যা নয়, কারণ তার সমাধানযোগ্যতা নেই। সমাধানও মানুষ করতে পারবে, তবেই তা হবে সমস্যা। মার্ক্সের বক্তব্য ছিল এমনই। তবুও, সমাধান মানেই সমস্যার অন্ত। তাই বলা যেতে পারে -- সমস্যায়ন - এটা মানুষিক ব্যাপার। যা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে দেখলাম। গণিত ধরে। কারণ তা প্রপঞ্চের প্রহেলিকা বা আজবত্বর অবসান ঘটায়। প্রপঞ্চ-র ঐশ্বরিকত্বের অবসান ঘটায়। এবং একই সাথে – সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা – সেটাও মানুষিক ব্যাপার। অর্থাৎ বাস্তবায়ন, আসলায়ন, স্থানীয়করণ ইত্যাদি। মানুষিক মানে হল – মানুষ যা করে, সচেতনে নয়, অচেতনে।

এইখানেই দুটি কথা বলা হল – সমস্যা এবং সমাধান – এই দুই বিশেষ্য পদ – এই দুই অস্তিত্ব – কিন্তু মানুষিক ব্যাপার নয়। সমস্যায়ন এবং বাস্তবায়ন – এই দুই অনস্তিত্ব – এই দুই সক্রিয়তা – এই দুই অধি-অস্তিত্ব – এইগুলো মানুষিক ব্যাপার। আমাদের হাত পা মাথা মুণ্ডু গা কোষ কলা ইত্যাদি চলে এই সমস্যায়ন এবং বাস্তবায়নে বা সমাধায়নে। অন্তর্কলন এবং সমাকলন তাই গাণিতিক ব্যাপার যতটা – বিমূর্ত ভাবে দেখলে – তা অত্যন্ত সামাজিক ব্যাপার – যেখানে মানুষ সক্রিয়। আমরা সারাক্ষণই সমস্যায়ন করে চলি এবং সমাধায়ন করে চলি।

****

বলা হল – সমস্যায়ন বা ফারাকিকরণ – সেখানে কল্পনার ভূমিকা বা সৃজনশীলতার ভূমিকা নির্ধারক। আবার বলা হল, সমস্যায়ন হল মানুষিক -- অর্থাৎ মানুষ যা করে অচেতনে, সচেতনে নয়। তাহলে কি দুই ধরনের কথা বলা হচ্ছেনা ? এটা কি স্ববিরোধ নয়? দুই ধরনের কথা তখনই হয়, যখন ধরে নেওয়া হয় – কল্পনা বা সৃজনশীলতা সচেতনের ব্যাপার, অচেতনের নয়। যদি কল্পনা এবং সৃজনশীলতা অচেতনের হয় – তাহলে দুটি একই কথা হয়, স্ববিরোধ থাকেনা।

উদাহরণে ফেরা যাক। বছর কুড়ি আগে কলকাতা শহরে বড় রাস্তায় সাইকেল চালানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি শুরু হয়, কারণ ধীর গতির যান সাইকেল (এবং রিক্সা ও ভ্যান) কলকাতার রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম তৈরি করে। কিন্তু আগে যারা কলকাতা শহরে সাইকেল চালাত, তারা বড় রাস্তায় সাইকেল চালানো বন্ধ করলনা। অনেকেই চালিয়ে যেতে লাগল, বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও। এই যে বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগল – সেটা কিন্তু কোনো জেদ থেকে নয়। কোনো 'অমান্য করব' এমন ভাবভঙ্গী থেকে নয়। বরং, তার কাছে সাইকেল-ই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক যান, তাই জন্য। হতে পারে, তার কাজের ধরন এরকম। হতে পারে, সে মিতব্যয়ী, তাই জন্য। হতে পারে আরো নানা কারণ। প্রতিটি মানুষই আলাদা। তাই কারণের পেছনে ছুটতে গেলে বহু বহু কারণ আসতে পারে। কিন্তু ব্যাপার যেটা দাঁড়াল, বহু মানুষ সাইকেল চালিয়ে যেতে থাকল শহর কলকাতার বড় রাস্তায়। তারা তৈরি করল একটা যাপন। বেআইনি যাপন। বছর দশেক আগে সেই বেআইনি যাপন তৈরি করল একটি প্রশ্ন – কেন কলকাতায় বড় রাস্তায় সাইকেল চালাতে দেওয়া হবেনা ? তারাই তৈরি করল প্রশ্নটা। এই যে কলকাতা শহরে বড় রাস্তায় যারা বেআইনি ভাবে সাইকেল চালিয়ে গেল, তাদের ছুঁড়ে দেওয়া ওপরের প্রশ্নটা – সেটাই তৈরি করল একটা সমস্যা। সমস্যাটা কী? 'কলকাতার বড় রাস্তায় সাইকেল কে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে?' সে সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। কলকাতাবাসী তার সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে – কিন্তু সমাধান হয়নি। কখনও প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে – চওড়া রাস্তায় সাইকেল লেন করে দাও। কিন্তু করবে কোথা দিয়ে জায়গা কোথায় ? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হল সমস্যায়ন ও সমাধায়নের একটা দৃষ্টান্ত। দুটিতেই মানুষ আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, যে কলকাতাবাসী শহরের বড় রাস্তায় সাইকেল চালু রাখল নিজেরা চালিয়ে -- তারা কিন্তু কোনো সচেতনতা থেকে করেছে ব্যাপারটা এমন নয়। বরং সে করছে অচেতনা থেকে। তারপর সে যখন প্রশ্নটা তুলল – কেন কলকাতায় সাইকেল চালাতে দেওয়া হবেনা, তখন এল কল্পনা বা সৃজনশীলতার প্রশ্ন। যা কিন্তু তাদের যাপননির্ভর। এই প্রশ্নটা মাথা থেকে বেরিয়েছে, এমন নয় – বরং বেরিয়েছে তাদের জীবন যাপন থেকে। এখানে আসা যাক, মাথা থেকে কী কী প্রশ্ন বেরোতে পারে – কেন কলকাতায় রাস্তায় রণ-পা পড়ে চলতে দেওয়া যাবে না ? কেন কলকাতার রাস্তায় হাতির পিঠে চলতে দেওয়া যাবে না? কেন সাইকেল কে কলকাতার রাস্তায় আড়াআড়ি চলতে দেওয়া হবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো মাথার প্রশ্ন। যাপনের থেকে আসা প্রশ্ন নয়। তাই কল্পনা বা সৃজনশীলতা বলতেই আমরা যেমন মনে করি, তা মাথা থেকে বেরোবে – তা কিন্তু নয়। কল্পনা বা সৃজনশীলতা যাপন থেকে আসে, মাটি থেকে আসে। কলকাতায় যারা সাইকেল চালাতনা – তারা সাইকেলের প্রশ্নটা শুনে বলল – কী চমৎকার একটা প্রশ্ন মাথা থেকে বেরিয়েছে ! কী কল্পনা ! কী সৃষ্টিশীলতা ! হ্যাঁ, তাদের কাছে এটা মাথা থেকে। কিন্তু যারা সাইকেল চালায়, তাদের কাছে এটা মাথা থেকে নয়। কল্পনা বা সৃজনশীলতা-কে যাপনের বাইরে থেকে দেখলে সচেতনার ফসল বলে মনে হয়। মাথাপ্রসূত বলে মনে হয়। কলকাতার বড় রাস্তায় সাইকেল প্রসঙ্গে আরো একটু বলা যাক। ধরা যাক, প্রশাসন বলল – ঠিক আছে। চওড়া রাস্তায় সাইকেল লেন বা সার্ভিস লেন মতো করে দিচ্ছি। সেখান দিয়ে সাইকেল চালাও। দেখা গেল, কিছু লোক চালাচ্ছে, কিন্তু কিছু লোকে সেখান দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে না। নানা কারণে। সেই গাড়ির রাস্তা দিয়েই চালাচ্ছে। কিছুতেই শুনছেনা। তখন আবার তা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। একটু খেয়াল করে দেখো তো, প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত মিশ্রণের সান্দ্রতার একের পর এক সমস্যায়নের চেষ্টার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছ কি না।

উদাহরণটা ভালোর দিকে দিলাম, মানে সাইকেল চালানো ভালো, সেটা ধরে নিয়ে বলছি। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ফারাকিকার বা সমস্যায়ন যে সব সময় ভালোর দিকে টেনে হবে তা নয়। বেশিরভাগ সময়েই না হবারই সম্ভবনা। যেমন ধরা যাক, সিকিম জৈব বা অর্গানিক চাষের রাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। ওখানে সব চাষ জৈব সার দিয়ে হয়। এবার তার মানে তো এই নয়, যে ওখানে সব লোক জৈব ভাবেই চাষ করবে। ধরা যাক, কিছু লোক ইউরিয়া সার কিনে জমিতে দিয়ে চাষ করা বন্ধ করে দেয়নি। বা সিন্থেটিক কীটনাশক বন্ধ করেনি। কারণ নানা কিছু আছে। হয়ত গোবরের অভাব, হয়ত ফলন ভালো হয়, হয়ত খরচ কম হয় – ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাতত তারা লুকিয়ে

চুরিয়ে করছে, বা ফসল সেভাবে বড় বাজারে আনছেনা। বা ধরা পড়ছেনা । এবার কিছুদিন পর থেকে লোক জানাজানি হল। প্রশাসন বন্ধ করতে পারবেনা, কারণ মানুষের প্রতিদিনের যাপনে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ অসম্ভব। প্রশাসন যেটা করতে পারে, সেই ফসলের বিক্রি বাটা বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। এইবার সিকিমের সেই রাসায়নিক চাষিরা প্রশ্নটা করল – কেন একটা সীমার মধ্যে রাসায়নিক নির্ভর চাষ বা মিশ্র চাষ করতে দেওয়া হবেনা ? ব্যস। সমস্যা তৈরি হয়ে গেল -- 'কীভাবে জৈব কৃষির রাজ্য সিকিমে সীমার মধ্যে রাসায়নিক বা মিশ্র চাষ হতে পারে'। মোটামুটি জনগ্রাহ্য ধারনা এখন এরকম – রাসায়নিক চাষ খারাপ, জৈব চাষ ভালো – এই ভালো-খারাপের ওপর দাঁড়িয়ে এই সমস্যায়ন কিন্তু খারাপের দিকে টেনে। খারাপের দিকে টেনে সমস্যায়নই বেশি। যেমন, চুরি করা খারাপ, কিন্তু লোকে চুরি করে। পরীক্ষার হলে নিজের খাতার উত্তর সম্পূর্ণ ভাবে নিজে লেখা ভালো, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ পাশের জনের কাছে জিজ্ঞেস করে অন্ততঃ, যদি টুকলি না-ও করে। এসবের সমাধায়নের চেষ্টাও করা হয়। খুব কড়া গার্ড, ধরা পড়লেই শাস্তি – ইত্যাদি সমাধান অনেকটা আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন। রাসায়নিক চাষের খোঁজ খবর পেলেই জেল, জরিমানাও আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন। কলকাতার কিছু বড়ো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে ধরা পড়লেই জরিমানা ও আংশিক বা দুর্বল সমাধায়ন।

*****

স্বাধীন চলকের তিল মাত্র ফারাকের সঙ্গে অন্য যা কিছুর সামান্য ফারাকের সম্পর্ক – এই ফারাকিকারের মাধ্যমে সমস্যায়ন কিন্তু কোনো খেয়াল খুশির বা আনতাবড়ি ব্যাপার নয়। মিশ্রণের সান্দ্রতার উদাহরণে গ্রাফে পরিমাপবিন্দুগুলির অবস্থানই কিন্তু একটি সম্পর্ককে বা একটি ফারাকিকারকে তুলে ধরায় বা অ্যাফার্ম করায়। সমস্যায়ন কখনোই খেয়াল খুশির বা আনতাবড়ি নয়।

উচ্চতর গণিতের অন্তর্কলন এবং সমাকলন – ফারাকিকরণ এবং বাস্তবায়ন – সমস্যায়ন এবং সমাধায়ন -- আমাদের শেখায় সমস্যায়ন এবং সমাধায়নের প্রয়োজনীয়তা, বলা ভালো, বাধ্য বাধকতা। ভৌতিক বা ফিজিক্যাল প্রপঞ্চ-র ধোঁয়াশা বা দৈবত্ব-র কুজ্ঝটিকা সরিয়ে তাকে মানুষের আওতাধীনে আনে সমস্যায়ন। একইভাবে সামাজিক প্রপঞ্চের স্বর্গত্ব (বানরকত্ব) সরিয়ে তাকে যা তা-ই, অর্থাৎ, মানুষিক ব্যাপার হিসেবে দাঁড় করায় সমস্যায়ন। মনুষ্য সমাজ স্বর্গ (বানরক) নয়। মানুষ দেবতা নয়। দেবতা হবেও না। খারাপ-ভালো সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষ। সমস্যায়ন এবং সমাধায়নের অন্তহীন চক্র মানুষের সীমাবদ্ধতা কে স্বীকৃতি দেয়।সমস্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ভালো/খারাপ এই বিচারধারা থেকে বার করে আনে।ভালো অথবা খারাপ এই নৈতিক বিচারের মাধ্যমে গ্রহণ বর্জনের পন্থায় বাতিল করার বা এক্সক্লুসনের ঝোঁক চলে আসে, এর বিপরীতে সমস্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গী ঠাঁই করে দিতে শেখায়। যা আমার মতো নয়, আমার পছন্দ মতো নয়, সেরকম সমস্ত কিছু ও থাকবে – এটাকে স্বীকৃতি দেয় সমস্যায়ন। মনুষ্য সমাজকে স্বর্গরাজ্য (বানরক) হওয়া থেকে আটকায় সমস্যায়ন। জীবনে রুচি আনে।